শ্রেণীর স্বার্থ ছিল বিভিন্ন। তাঁরা আসতও নানা রকমের ধর্মীয় গোষ্ঠী ও জাত থেকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগঠন

ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণী ছিল আকারে বিরাট, সারা দেশে ছড়ানো, সুসংগঠিত এবং অত্যন্ত পেশাদার। কেউ দূরপাল্লার, আন্তঃ-আঞ্চলিক ব্যবসায়ে, কেউ স্থানীয়, খুচরো ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ছিল। প্রথম ধরনের লোকেদের বলা হত *শেঠ, বোহরা,* বা *মোদি*; এবং দ্বিতীয় ধরনের লোকেদের বলা হত *বেওপারি,* বা *বণিক*। খুচরো পণ্যের ব্যাবসা ছাড়াও গ্রাম ও শহরগুলোতে *বণিকদের* নিজস্ব দালাল থাকত, যাদের সাহায্যে তাঁরা খাদ্যশস্য ও নগদা ফসল কিনত। এক বিশেষ ধরনের বণিক ছিল *বনজারা,* যারা ভারী পণ্যের পরিবহনে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল। *বনজারারা* অনেক দূরত্ব অতিক্রম করত, কোনো কোনো সময় কয়েক হাজার বলদের পিঠে খাদশস্য, ডাল, ঘি, নুন ইত্যাদি চাপিয়ে। আরও বেশি মহার্ঘ যে দ্রব্যগুলো, যেমন বস্ত্র, রেশম ইত্যাদি চাপানো হত উট ও খচ্চরের ওপরে, কিংবা গাড়িতে। তবে, নদীপথে নৌকায় ভারী দ্রব্য পরিবহন করা সস্তা পড়ত। আজকের তুলনায় তখন জলপথে নৌকায় পরিবহন, এবং তটরেখা বরাবর উপকূলীয় বাণিজ্য অনেক বেশি উন্নত ছিল। এই যুগে আন্তঃ-আঞ্চলিক বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল খাদ্যদ্রব্য এবং বিস্তৃত বস্ত্রসম্ভারের বাণিজ্য। বাংলা চাল ও চিনি, এবং তার সঙ্গে সূক্ষ্ম মসলিন ও রেশম রপ্তানি করত। বস্ত্র উৎপাদনের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল করমণ্ডল উপকূল। উপকূল ধরে ও দাক্ষিণাত্য পেরিয়ে গুজরাতের সঙ্গে তার অত্যন্ত চালু বাণিজ্য ছিল। গুজরাত ছিল বিদেশি দ্রব্যের প্রবেশদ্বার। এটি উত্তর ভারতে মিহি কাপড় ও রেশম (*পাটোলা*) রপ্তানি করত, এই বাণিজ্যের দুটি সংযোগস্থল ছিল বুরহানপুর ও আগ্রা। এটি

Scanned by CamScanner

বাংলা থেকে খাদ্যশস্য ও রেশম পেত এবং মালাবার থেকে গোলমরিচ আমদানি করত। উত্তর ভারত আমদানি করত বিলাসদ্রব্য এবং রপ্তানি করত নীল ও খাদ্যশস্য। লাহোর ছিল হস্তশিল্প উৎপাদনের আরেকটি কেন্দ্র। এটি ছিল কাশ্মীরের বিলাসদ্রব্য — শাল, গালিচা ইত্যাদির বিতরণ কেন্দ্র। পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের পণ্যগুলো সিন্ধু নদ বেয়ে পরিবাহিত হত। এর সঙ্গে একদিকে কাবুল ও কান্দাহারের, এবং অন্যদিকে দিল্লি ও আগ্রার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগ ছিল।

এইভাবে দেখা যাবে যে ভারতের আন্তঃ-আঞ্চলিক বাণিজ্য কেবল বিলাসদ্রব্য নিয়েই চলত না। এইসব জিনিসের চলাচল একটি জটিল যোগসূত্রের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল, যা প্রতিনিধি (*গুমশতা*) এবং দালালি পাওয়া প্রতিনিধিদের (*দালাল*) মাধ্যমে পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরের ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ঘটাত। ১৭শ শতকে গুজরাতে আগত ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা দেখেছিল যে ভারতীয় বণিকরা সক্রিয় ও সজাগ। ভেতরকার খবর জানবার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা হত, এবং যখনই দেশের কোনো অংশে জিনিসের চাহিদা দেখা যেত, তখনই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হত।

পণ্যের চলাচল সহায়তা লাভ করেছিল একটি অর্থব্যবস্থার বিকাশের দ্বারা, যা দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে টাকা পাঠানো সহজ করে দিয়েছিল। এটি করা হত *হুন্ডি* ব্যবহার করে। *হুন্ডি* ছিল কিছুকাল পরে কিছুটা ছাড়-সহ প্রদানযোগ্য ঋণপত্র। *হুন্ডির* মধ্যে প্রায়শই বিমা ধরা থাকত যা পণ্যের মূল্য, গন্তব্য স্থল, পরিবহনের মাধ্যম (সড়ক, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি) অনুসারে বিভিন্ন হারে ধার্য করা হত। *সরাফরা* (*সরফ*), যারা মুদ্রাবিনিময়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তাঁরা *হুন্ডির* কারবারেও বিশেষজ্ঞ ছিল। এই পদ্ধতিতে তাঁরাও ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে কাজ করত : তাঁরা অভিজাতদের কাছে থেকে টাকা নিয়ে জমা রাখত, এবং তা ধার দিত। *হুন্ডির* মাধ্যমে তাঁরা ঋণের ব্যবস্থা করে দিত, যা চালু নগদ টাকার পরিপূরক ছিল। ব্যবসায়ীরা যেহেতু তাঁদের গন্তব্য স্থলে জিনিস বেচার পর নগদ টাকা *হুন্ডি* করে নিতে পারত, তাই নগদের চলাচল, যা সব সময়েই ঝুঁকির বিষয় ছিল, তা কমানো যেত, বিশেষত যখন ভীরজি ভোরার মতো ধনী বণিকরা ভারতের বিভিন্ন অংশে, এমনকি পশ্চিম এশিয়াতেও, লেনদেনের কেন্দ্র (এজেন্সি হাউস) খুলেছিলেন।

ভারতের বণিক সম্প্রদায় কোনো একটি জাত বা ধর্মের ছিল না। গুজরাতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল হিন্দু, জৈন, এবং মুসলমানরা, যাদের অধিকাংশই ছিল বোহ্‌রা। রাজস্থানে অসওয়াল, মাহেশ্বরী এবং আগরওয়ালদের মারওয়াড়ি নামে ডাকা শুরু হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার দিকে সড়কপথে বাণিজ্য ছিল মুলতানি, আফগান ও ক্ষত্রীদের হাতে। ১৮শ শতকে মারওয়াড়িরা মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। করমণ্ডল উপকূলে চেট্টিরা এবং মালাবারের মুসলমান বণিকরা, ভারতীয় ও আরব উভয়েই, দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বণিক সম্প্রদায়টি সৃষ্টি করেছিল।

Scanned by CamScanner

ভারতে, বিশেষত বন্দর শহরগুলোতে, বণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল ধনিকশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের কয়েকজন, যারা সম্পদ ও ক্ষমতার দিকে থেকে ইউরোপের বণিক-রাজাদের সঙ্গে তুলনীয়। এইভাবে, ভীরজি ভোরা বেশ কয়েক দশক ধরে সুরাটের বাণিজ্যের ওপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। তাঁর একটি বড়ো নৌবহর ছিল এবং তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার সবচেয়ে সম্পদশালীদের মধ্যে একজন। আবদুল গফুর বোহ্‌রা ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় নগদ ও জিনিস মিলিয়ে ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৭টি সমুদ্রগামী জাহাজের একটি বহর রেখে গিয়েছিলেন। একইভাবে, করমণ্ডল উপকূলের মলয় চেট্টি, কাশী বীরান্না ও সুনকা রামা চেট্টির বিপুল বিত্তশালী হিসাবে খ্যাতি ছিল, এবং ভারতে ও বিদেশে তাঁদের বিস্তৃত বাণিজ্যিক কারবার ছিল। আগ্রা, দিল্লি, বালাসোর (ওড়িশা) ও বাংলাতেও বহু ধনী ব্যবসায়ী ছিল। এইসব ব্যবসায়ীদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষত যারা উপকূলীয় শহরগুলোতে থাকত, তাঁরা আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে বাস করত এবং আমিরদের আদবকায়দা অনুকরণ করত।

দিল্লি ও আগ্রার ধনী বণিকরা যেসব প্রশস্ত ও সুনির্মিত বাড়িগুলোতে বাস করত ইউরোপীয় পর্যটকরা সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, সাধারণ ব্যবসায়ীরা থাকত তাঁদের দোকানঘরের ওপরের বাড়িতে। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা চাইত নিজেদের গরিব হিসাবে দেখাতে, কারণ তাঁরা ভীত ছিল যে তাঁদের "জলভরা স্পঞ্জের" মতো ব্যবহার করা হবে, এবং তাঁদের সম্পদ নিংড়ে নেওয়া হবে। এটি পুরোপুরি ঠিক বলে মনে হয় না। শের শাহের সময় থেকে বাদশাহরা বণিকদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেক আইন করেছিলেন। শের শাহের আইনগুলো বিখ্যাত হয়ে আছে। জাহাঙ্গিরের অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে একটিতে সংস্থান রাখা হয়েছিল যে "যদি কেউ, অবিশ্বাসী বা মুসলমান, মারা যায়, তবে তাঁর বিষয়সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখা থাকবে, এবং কেউ তাঁদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তাঁরা সম্পত্তির দেখভালের জন্য পরিদর্শক ও পৃথক তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করবে, যাতে করে এর মূল্যকে কোনো আইনসংগত কাজে, যেমন মসজিদ বা সরাই নির্মাণ, ভাঙা সেতু সারানো এবং পুকুর ও কুয়ো খোঁড়ার কাজে খরচ করা হয়।" তবে, স্থানীয় কর্মচারীরা সব সময় নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের হয়রান করতে পারতেন। কিছু হয়রানি সত্ত্বেও, বণিকদের সম্পত্তি সাধারণভাবে বিপন্ন হত না। পরিবহন মাধ্যম তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে সস্তা ও পর্যাপ্ত ছিল। কিছু ইউরোপীয় পর্যটকের অভিযোগ সত্ত্বেও পথে নিরাপত্তা ছিল সন্তোষজনক, এবং তা বিমার দ্বারা সুরক্ষিত করা যেত। ৫ *কোস* দূরে-দূরে সরাইবিশিষ্ট প্রধান রাজপথগুলোতে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল তৎকালীন সময়ের ইউরোপের মতোই ভালো। এসব সত্ত্বেও, বাণিজ্য ও বণিকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নীচু। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপরে বণিকদের প্রভাব কতটা ছিল তা বিতর্কের বিষয়। ভারতে ব্যবসায়ীদের যেখানে স্বার্থ জড়িত থাকত, সেখানে রাজনৈতিক মহলে তাঁরা প্রভাবহীন ছিল না। এইভাবে, প্রত্যেক বণিক সম্প্রদায়ের নেতা বা *নগরশেঠ* থাকত, যিনি তাঁদের হয়ে স্থানীয় কর্মচারীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতেন। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে জোরালো ভাবে তুলে ধরতে আহমেদাবাদ

Scanned by CamScanner

ও অন্যত্র বণিকরা ধর্মঘট (*হরতাল*) করছে এমন নজিরও আছে। আমরা লক্ষ করেছি যে বাণিজ্যের সঙ্গে মুঘল রাজপরিবারের সদস্যগণ, বিশিষ্ট অভিজাতবৃন্দ, যেমন মির জুমলা, জড়িত ছিলেন।

এইভাবে, মুঘল শাসকশ্রেণী দেশের বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থের সুরক্ষার প্রতি উদাসীন ছিল না, যদিও ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড ইত্যাদি কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মতো এটি নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিল না।

১৭শ শতকে একাধিক কারণে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মুঘল শাসনে দেশের রাজনৈতিক একতা এবং বিস্তৃত এলাকার ওপরে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। মুঘলরা রাস্তা ও সরাইগুলোর ওপরে নজর দিয়েছিল, যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করেছিল। সাম্রাজ্যে প্রবেশের সময় পণ্যের ওপরে একই হারে কর চাপানো হত। পথকর বা *রাহদারি* বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছিল, যদিও কয়েকজন স্থানীয় রাজা তা আদায় করতে থাকেন। মুঘলরা উচ্চ বিশুদ্ধতার রুপোর টাকা তৈরি করত, যা ভারতে এবং বিদেশে প্রামাণ্য মুদ্রা হয়ে উঠেছিল, এবং এইভাবে ভারতের বাণিজ্যকে সহায়তা করেছিল।

মুঘলদের কিছু নীতি অর্থনীতির বাণিজ্যিকিকরণে বা একটি মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিকাশে সাহায্য করেছিল। স্থায়ী সেনাবাহিনী ছাড়াও বহু প্রশাসনিক কর্মচারীর (কিন্তু অভিজাতদের নয়) বেতন নগদে দেওয়া হত। *জাবতি* ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব পরিমাপ করা হত এবং তা নগদে দিতে হত। এমনকি যখন রায়তকে অন্যান্য ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি — যেমন শস্য ভাগ করে নেওয়া — পছন্দ করতে দেওয়া হত, তখনও রাষ্ট্রের প্রাপ্য, সাধারণত, শস্যব্যবসায়ীদের মারফত গ্রামে বিক্রয় করা হত। এটি হিসাব করা দেখা গেছে যে গ্রামীণ উৎপন্নের প্রায় ২০ শতাংশ বাজারজাত করা হত, যা সমগ্রের অনুপাত হিসাবে বেশি ছিল। গ্রামীণ শস্যবাজারের বিকাশের ফলে ছোটো শহর বা *কসবার* উদ্ভব ঘটেছিল। সব ধরনের বিলাসদ্রব্যের জন্য অভিজাতদের চাহিদার কারণে হস্তশিল্পের উৎপাদন ও শহরের বিকাশ ঘটেছিল।

ইতিমধ্যেই ১৬শ শতকে দেশে বেশ কিছু প্রধান শহরের বিকাশ ঘটে গিয়েছিল। র‍্যালফ ফিচের বর্ণনানুসারে, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রি ছিল তদানীন্তন ইউরোপের বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে একটি লন্ডনের থেকেও বড়ো। আকবরের দরবারে আগত জেসুইট পাদ্রি মনসেরাট বলেছেন যে ইউরোপ বা এশিয়ার কোনো শহরের থেকেই লাহোর খাটো ছিল না। একটি সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে ১৭শ শতকে আগ্রা আয়তনে দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গিয়েছিল। বার্নিয়ের, যিনি ১৭শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে লিখে গেছেন, তিনি বলেছেন যে দিল্লি প্যারিসের থেকে ছোটো ছিল না, এবং আগ্রা ছিল দিল্লির থেকেও বড়ো। এই যুগে পশ্চিমে আহমদনগর ও বুরহানপুর, উত্তর-পশ্চিমে মুলতান, পূর্বে পাটনা, রাজমহল ও ঢাকা বড়ো শহর হয়ে উঠেছিল। এইভাবে, আহমেদাবাদ ছিল লন্ডন ও তার শহরতলির

Scanned by CamScanner

চিত্র ৫.১ : আকবরি মুদ্রা

মতো বড়ো, এবং পাটনার জনসংখ্যা ছিল দু-লাখ — সে যুগের মাপকাঠিতে অনেক বেশি। এইসব শহর শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না, ব্যাবসা এবং শিল্পের কেন্দ্র হিসাবেও বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

গ্রামীণ উৎপন্নের এক বিরাট অংশ, যা নগদে রূপান্তরিত করে ফেলা হত, তা আদায় করতে মুঘলদের সক্ষমতা, এবং সেটি আমিরদের কুক্ষিগত হওয়ায়, বাড়িঘর, সরাই, *বাওলি* ইত্যাদি বানানোর ইমারতি সরঞ্জাম-সহ সব ধরনের বিলাসদ্রব্যের চাহিদাসৃষ্টিতে উদ্দীপনা এসেছিল। অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের বিকাশ — সব ধরনের বন্দুক, কামান, বর্ম ইত্যাদি; এবং জাহাজের সরঞ্জাম নির্মাণ ছিল এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে যে পরিণতি ঘটেছিল তারই নমুনা। আকবর ও ঔরঙ্গজেব উভয়েই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায় এমন বন্দুক-সহ সব রকমের বন্দুক নির্মাণে উৎসাহী ছিলেন, এবং সেগুলোর উৎপাদনের উন্নতি ঘটাতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ভারতীয় ইস্পাতের তলোয়ারের ভারতের বাইরেও চাহিদা ছিল। ১৬৫১ সালে শাহজাহান সমুদ্রগামী জাহাজ বানানোর একটি প্রকল্প নিয়েছিলেন, এবং পশ্চিম এশিয়ায় যাত্রা করার জন্য চারটি থেকে ছ-টি জাহাজ বানানো হয়েছিল। পরের বছর ছ-টি জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছিল। এটি ছিল বহু ধনী বণিক এবং অভিজাতদের জাহাজনির্মাণ প্রকল্পের একটি অঙ্গ। এর ফলে, ভারতীয় জাহাজনির্মাণ ক্ষেত্রগুলোতে শীঘ্রই ইউরোপীয় আদলে জাহাজ বানানো শুরু হল, এবং পশ্চিম এশিয়াগামী মালের ভাড়া কমানো হল।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও ইউরোপীয় বণিকগণ

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে একাধিক বন্দর ও শহর ছিল যেখান থেকে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের চালু বাণিজ্য বজায় রাখা হত। ভারত শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম

Scanned by CamScanner

এশিয়ার অনেক দেশে চাল, চিনি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করত না, এই অঞ্চলের বাণিজ্যে ভারতীয় বস্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। একজন ইংরেজ প্রতিনিধি লক্ষ করেছিলেন, "এডেন থেকে আচিন (মালয়) পর্যন্ত প্রত্যেকে আপাদমস্তক ভারতীয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত।" এই মন্তব্যটি, যদিও কিছুটা অতিশয়োক্তি (কারণ মিশর এবং অটোমান তুরস্কও বস্ত্রোৎপাদন করত), মূলগতগত ভাবে সত্যি ছিল। এটিই কার্যত ভারতকে এশীয় জগতের শিল্পশালায় পরিণত করেছিল (চিন ব্যতিরেকে)। ভারতের যা আমদানি করার প্রয়োজন ছিল তা হল কয়েকটি ধাতু, যেমন টিন (টিন লাগত ব্রোঞ্জ বানাতে), তামা, এগুলোর উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না; খাদ্য এবং ওষুধের জন্য কয়েক রকমের মশলা; যুদ্ধের ঘোড়া এবং বিলাসদ্রব্য (যেমন হাতির দাঁত)। সুবিধাজনক বাণিজ্যিক ভারসাম্য মেটানো হত সোনা ও রুপো আমদানির দ্বারা। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে ১৭শ শতকে ভারতে রুপো এবং সোনা আমদানি বেড়ে গিয়েছিল এতটাই যে বার্নিয়ের বলেছেন যে, "সোনা এবং রুপো, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে ঘুরে আসার পর শেষ পর্যন্ত সোনা ও রুপোর গহ্বর ভারতে নিমজ্জিত হয়।" এই মন্তব্যটিও অতিশয়োক্তির ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, কারণ সেই যুগে প্রত্যেক দেশ সোনা ও রুপো ধরে রাখার চেষ্টা করত। তবে, কেবল ভারত ও চিন তাদের অর্থনীতির নিরিখে এবং অনেকটা স্বনির্ভর হওয়ার কারণে এতে অনেকটা সফল হয়েছিল।

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে ১৫শ শতকের শেষ দিকে ভারতে পোর্তুগিজদের আগমন ঘটেছিল। ১৭শ শতকে অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় বণিক, বিশেষত ওলন্দাজ, ইংরেজ, ও পরবর্তী কালে ফরাসিরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল। এই উদ্যোগ ছিল কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের দ্রুত প্রসারণের ফলে ইউরোপীয় অর্থনীতির যে বিকাশ ঘটেছিল, তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি।

১৬শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পোর্তুগিজ শক্তির অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। পোর্তুগিজদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও, ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা গোলকোন্ডার শাসকের কাছ থেকে একটি *ফরমান* লাভ করে মসুলিপটমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। তাঁরা নিজেদের মশলা দ্বীপে (যবদ্বীপ এবং সুমাত্রা) প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যাতে করে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁরা মশলা দ্বীপে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ওলন্দাজরা প্রথমে মশলার বাণিজ্যের খাতিরেই উপকূলে এসেছিল। কিন্তু তাঁরা শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিল যে ভারতীয় বস্ত্রের বিনিময়ে সবচেয়ে সহজে মশলা পাওয়া যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সবচেয়ে বেশি কদর ছিল করমণ্ডল উপকূলে উৎপন্ন কাপড়ের, এবং তা নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল সবচেয়ে সস্তা। সুতরাং, ওলন্দাজরা স্থানীয় একজন রাজার কাছ থেকে পুলিকট লাভ করে তাঁরা সেটিকে নিজেদের কাজকর্মের ঘাঁটি বানিয়েছিল এবং করমণ্ডল উপকূলে মসুলিপটম থেকে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ওলন্দাজদের মতো ইংরেজরাও মশলার বাণিজ্যের জন্য প্রাচ্যে এসেছিল, কিন্তু

Scanned by CamScanner

ওলন্দাজরা, যাদের সম্পদ ছিল বেশি এবং যারা ইতিমধ্যেই মশলা দ্বীপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল, তাঁদের বৈরিতা ইংরেজদের বাধ্য করেছিল ভারতের ওপর মনঃসংযোগ করতে। সুরাটের বাইরে একটি পোর্তুগিজ নৌবহরকে যুদ্ধে হারানোর পর তাঁরা, শেষ পর্যন্ত, সেখানে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে একটি কুঠি স্থাপন করতে পেরেছিল। স্যর টমাস রো-র সাহায্যে ১৬১৮ সালে জাহাঙ্গিরের একটি *ফরমান* দ্বারা সেটি স্থায়ী মর্যাদা পেল। ওলন্দাজরা পিছুপিছু এল এবং সুরাটেও একটি কুঠি বানাল।

ভারতের কাপড়ের রপ্তানি বাণিজ্যে গুজরাতের গুরুত্ব ইংরেজরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিল। লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরের বন্দরগুলোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের মধ্যে তাঁরা জোর করে ঢুকতে চাইল। পারসিক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা পারস্য উপসাগরের প্রবেশপথে পোর্তুগিজদের ঘাঁটি ওরমুজ বন্দরটি দখল করল।

এইভাবে, ১৭শ শতকের প্রথম পাদে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা উভয়েই ভারতীয় বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, এবং পোর্তুগিজদের একচেটিয়া কারবার চিরতরে ভেঙে গিয়েছিল। পোর্তুগিজরা গোয়া এবং দমন ও দিউতে থেকে গেল, কিন্তু ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তাঁদের ভাগ ক্রমাগত কমে গিয়েছিল এবং শতকের শেষে এসে তা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল।

সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে সমুদ্রে তাঁদের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, ইউরোপীয়রা এশীয় জলরাশি থেকে ভারতীয় বণিকদের বিতাড়িত করতে পারেনি। বস্তুত, ভারতের যেকোনো অংশ থেকে — গুজরাত, করমণ্ডল, বা বাংলা — ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর অংশভাগ ছিল একটি ভগ্নাংশ মাত্র। ভারতীয় বণিকরা অনেকগুলো কারণে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল : কাপড়ের ব্যাবসার কথা ধরলে, ভারতীয় বণিকরা দেশীয় এবং বৈদেশিক উভয় বাজারই ভালো ভাবে জানতেন। তা ছাড়া, ভারতীয়রা কম লাভে কাজ করত — ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লাভে, যেখানে ওলন্দাজরা ব্যাবসার ন্যূনতম আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন কারখানার খরচ, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদির খরচ মেটানোর জন্য লাভ রাখত ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই একইরকম ছিল। ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা দেখেছিল যে মুঘল প্রশাসন ও ভারতীয় বণিকদের সহায়তা ব্যতীত তাঁরা ভারতে বাণিজ্য করতে পারবে না, অথবা এমনকি তাঁদের কুঠিগুলোর লোকজনদের খাওয়াতেও পারবে না। এইসব কারণে এবং তাঁদের কাজকর্মের খরচ কমানোর জন্য তাঁরা তাঁদের জাহাজে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মালপত্র নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এতে ভারতীয় বণিকদের বিশেষ আপত্তি ছিল না, কারণ এটি তাঁদের নিজেদের কাজকর্মকে আরও সুরক্ষিত করেছিল। একই সময়ে ভারতীয় জাহাজি কারবার শতকের মাঝামাঝি সুরাটে ৫০টি জাহাজের থেকে — তাদের মধ্যে অনেকগুলোই বেশ মজবুত ছিল — শতকের শেষে অন্তত ১১২ টিতে পৌঁছেছিল। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ শিল্পের বিকাশের এটিও আরেকটি সূচক ছিল।

Scanned by CamScanner

এশীয় বাণিজ্যে ভাগ রাখা ছাড়াও ইংরেজ ও ওলন্দাজরা ভারত থেকে ইউরোপে রপ্তানি করার জন্য জিনিস খুঁজে বেড়াত। প্রথমে, "প্রধান বাণিজ্য" ছিল নীলের, যা পশমের কাপড় রং করতে ব্যবহৃত হত। সবচেয়ে ভালো মানের নীল গুজরাতের সরখেজ এবং আগ্রার কাছে বায়ানায় উৎপন্ন হত। শীঘ্রই ইংরেজরা ইউরোপে ভারতীয় বস্ত্র "ক্যালিকো"* রপ্তানির বিকাশ ঘটাল। প্রথমে, গুজরাতের উৎপন্ন দ্রব্যই এই জন্য যথেষ্ট ছিল। চাহিদা যেমন বাড়ল, ইংরেজরা আগ্রা এবং তার আশপাশের এলাকায় উৎপন্ন কাপড় চাইতে থাকল। এমনকি, এ-ও যথেষ্ট হল না। তাই, করমণ্ডলকে জোগানের বিকল্প উৎস হিসাবে গড়ে তোলা হল। ১৬৪০ সালের মধ্যে করমণ্ডল থেকে রপ্তানিকৃত কাপড় গুজরাত থেকে রপ্তানিকৃত কাপড়ের সমান হয়েছিল, এবং ১৬৬০ সালের মধ্যে তা গুজরাত থেকে পাঠানো কাপড়ের তিনগুণ হয়ে উঠেছিল। মসুলিপটম এবং ফোর্ট সেন্ট জর্জ, যেটি পরে মাদ্রাজ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল, সে-দুটি ছিল এই বাণিজ্যের দুটি প্রধান কেন্দ্র। করমণ্ডল থেকে ক্যালিকো ও নীল উভয়ই রপ্তানি করে ওলন্দাজরা ইংরেজদের নতুন উদ্যোগে যোগদান করল।

ইংরেজরা সিন্ধু নদের মোহনায় লহরি বন্দরটির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখেছিল, যেটি সিন্ধু নদ বেয়ে মালপত্র পরিবহন করে মুলতান ও লাহোরের উৎপন্ন দ্রব্যকে আকৃষ্ট করতে পারত। কিন্তু, সেখানকার বাণিজ্য গুজরাত বাণিজ্যের অধীনস্থ হয়েই ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলা ও ওড়িশার বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য তাঁদের উদ্যোগ। পূর্ব বাংলায় পোর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের কার্যকলাপ এই উন্নয়নকে শ্লথ করে দিয়েছিল। তবে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হুগলী এবং ওড়িশার বালাসোরে ইংরেজরা গেড়ে বসেছিল, সেখান থেকে কাপড় ছাড়াও কাঁচা রেশম ও চিনি রপ্তানি করত। আরেকটি জিনিস যেটি রপ্তানি করার জন্য তৈরি করা হত, তা হল সোরা, যা ইউরোপীয় বারুদের পরিপূরক হিসাবে কাজ করত এবং তা দিয়ে ইউরোপগামী জাহাজগুলোর খোল ভরানো হত। সবচেয়ে ভালো সোরা পাওয়া যেত বিহারে। পূর্ব দিকের অঞ্চল থেকে রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শতকের শেষে করমণ্ডল থেকে রপ্তানির সমমূল্যের হয়ে উঠেছিল।

এইভাবে, ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানিগুলো ভারতের জন্য নতুন বাজার এবং রপ্তানিযোগ্য জিনিসের পথ খুলে দিয়েছিল। ১৭শ শতকের শেষ পাদে ভারতীয় বস্ত্র ইংল্যান্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জনৈক ইংরেজ পর্যবেক্ষক যেমন লিখেছেন, "মেয়েদের পোশাকই হোক, কিংবা আমাদের বাড়িঘরের আসবাবপত্র, পশম বা রেশম দিয়ে সেগুলো বানানো হত, তার প্রায় সবটাই জোগান দিত ভারতীয় বাণিজ্য।" ১৭০১ সালে আন্দোলনের ফলে পারস্য, চিন অথবা ইস্ট ইন্ডিজের (অর্থাৎ, ভারত) "সমস্ত চিত্রিত, রং করা, ছাপা বা রঙে ছোপানো ক্যালিকো" নিষিদ্ধ করা হল। কিন্তু, ভারী রকমের জরিমানা চাপানো এই আইনগুলো বা অন্যসব আইনের প্রভাব পড়েছিল খুব কম। ছাপা কাপড়ের

*চাদর বা পোশাকের জন্য সাদা বা নকশাদার কাপড় বিশেষ। — অনুবাদক।

Scanned by CamScanner

জায়গায় সাদা ভারতীয় ক্যালিকোর রপ্তানি, যা ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ১.৭ লক্ষ টুকরো, তা ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে এক লাফে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২০ লক্ষ।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ, দেশে সোনা ও রুপোর আমদানি, এবং দ্রুত সম্প্রসারণশীল ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ঘটার অনেকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি ছিল। ভারতীয় অর্থনীতি যেমন বেড়েছিল, দেশে রুপো ও সোনার আমদানি বেড়েছিল আরও দ্রুত হারে। এর ফলে, ১৭শ শতকের প্রথমার্ধে দ্রব্যমূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন অংশের ওপর এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কী পড়েছিল তা এখনও বিশদে খতিয়ে দেখা হয়নি। এটি সম্ভবত গ্রামগুলোর সাবেকি, পরম্পরাগত বাঁধনগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছিল এবং অভিজাতশ্রেণীকে অনেক বেশি অর্থমুখী, লোভী ও চাহিদাবিশিষ্ট করে তুলেছিল।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ভারতে সোনারুপো রপ্তানি করার বিকল্পের সন্ধান করেছিল। একটি পদ্ধতি ছিল মশলার বাণিজ্যকে একচেটিয়া করে নিয়ে এশীয় বাণিজ্যিক কাঠামোতে অংশগ্রহণ করা এবং ভারতীয় কাপড়ের ব্যাবসাকে কবজা করা। আমরা দেখেছি যে, এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা সীমিত সাফল্য পেয়েছিল। তাই, তাঁরা চেষ্টা করেছিল ভারত ও প্রতিবেশী এলাকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে, যাতে তাঁরা ইউরোপে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য রাজস্ব দিতে পারে। ওলন্দাজরা যবদ্বীপ ও সুমাত্রা দখল করেছিল। কিন্তু, ভারতই ছিল আসল চাবিকাঠি। ভারতবিজয়ের জন্য ফরাসি ও ইংরেজ উভয়েই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যতদিন ভারত প্রথমে মুঘল শাসনে এবং পরে দক্ষ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ছিল, তাঁরা সফল হতে পারেনি। তাঁরা কেবল তখনই সফল হল যখন অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত নানা কারণ এইসব রাষ্ট্রগুলোকে দুর্বল করে দিল। পরের একটি খণ্ডে আমরা এইসব পরিবর্তন সম্বন্ধে পড়ব।*

*বিপান চন্দ্র, পার্থোলিপিত ... অনুবাদক।

Scanned by CamScanner